সাহিত্য পত্রিকা ॥ বর্ষ : ৫৫ ॥ সংখ্যা : ৩ ॥ জুন ২০১৮

পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় : প্রান্তজনের মুক্তিযুদ্ধ-দর্শন

খন্দকার ফারহানা রহমান*

সারসংক্ষেপ : বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে সৈয়দ শামসুল হক নিরীক্ষাসফল নাট্যকার। তাঁর পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় নাটকটি বাংলার গ্রামীণ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মুক্তিযুদ্ধভাবনার শিল্পরূপ। মুক্তিবাহিনী বা পাকিস্তানি বাহিনীর শরীরী উপস্থিতি না থাকলেও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সর্বাংশে ধারণ করে এই নাটক চিরায়ত শোষণমুক্তির আকাঙ্ক্ষায় পরিব্যাপ্ত। বাঙালির জাতীয় জীবনের মহত্তম ঘটনা মুক্তিযুদ্ধ এদেশের প্রান্তিক জনমানুষের মধ্যে কীভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল, এই নাটক তার একটি শিল্পভাষ্য। আলোচ্য প্রবন্ধে কেন্দ্রীয় রাজনীতি থেকে বহুদূরে থাকা প্রান্তবর্তী মানুষের জীবনে মুক্তিযুদ্ধের অভিঘাতের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে।

বাংলাদেশের নাট্যধারায় সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-২০১৬) অগ্রগামী শিল্পব্যক্তিত্ব। বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় জারিত হয়ে বাংলা নাটক ও নাট্যমঞ্চে স্বাধীনতা-উত্তরকালে যেসব নাট্যকার অসামান্য সার্থকতা প্রদর্শন করেছেন তিনি তাঁদের মধ্যে প্রতিনিধিস্থানীয়। অবশ্য কেবল নাটকই নয় বাংলাদেশের সমকালীন সাহিত্যের বৈচিত্র্যময় রূপাঙ্গিকে বিষয় ও প্রকরণে তিনি সংযোজন করেছেন নিত্যনব মাত্রা। নাট্যসাহিত্যের এ-নবধারায় সৈয়দ হক কাব্যনাটক রচনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে করে তুলেছেন প্রধান নাট্য-উপাদান। এরই অংশ হিসেবে তিনি রচনা করেছেন তাঁর প্রথম কাব্যনাটক *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* (১৯৭৬)। বাঙালি জাতিসত্তার পরিচিহ্নায়নে একাত্তর-পরবর্তী নাট্যস্রোতে এ-নাটকটির অবস্থান ঐতিহাসিকভাবে তাৎপর্যমণ্ডিত। অপরাপর সাহিত্যসৃষ্টির মতো মঞ্চসফল এ-নাটকেও তিনি নির্মাণ করেছেন স্বতন্ত্র বীক্ষণ। মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের প্রান্তিক মানুষের অবস্থান, অংশগ্রহণ ও সংলগ্নতার নাট্যভাষ্য *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়*।

১.

সৈয়দ শামসুল হকের নাট্যবিশ্বে কাব্যনাটকই প্রধান। একজন রাজনীতিসচেতন কথাসাহিত্যিকের প্রত্যক্ষ রাজনীতিবোধ ও কবির ভাববাদী সত্তার সহযোগ সন্নিপাতে

---

*প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, তেজগাঁও মহিলা কলেজ, ঢাকা।

https://doi.org/10.62328/sp.v55i3.14

নির্মিত হয়েছে তাঁর কাব্যনাটক। *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* তাঁর সেই চেতনারই প্রদীপ্ত স্বাক্ষর। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানি শাসকচক্রের শাসন-শোষণের প্রতিক্রিয়ায় বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনার যে মহীরুহরূপ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে সুপ্রত্যক্ষ ও রূপবান হয়ে ওঠে তারই অসামান্য নাট্যরূপ *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* । রাজধানী ঢাকা থেকে দূরবর্তী গ্রামীণ সংস্কৃতিনির্ভর কৃষিজীবী-শ্রমজীবী প্রান্তিক জনতা মুক্তিযুদ্ধকে কীভাবে দেখেছে তার একটি বাস্তবানুগ বিবরণ হচ্ছে এ-নাটক। নাট্যকার স্পষ্টভাবে বলতে চান, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ কেবল সমগ্র বাংলাদেশের ওপর কেন্দ্র থেকে আরোপিত কোনো বিষয় ছিল না; বরং তা ছিল অনেক বেশি প্রান্তিক জনতার মর্মমূললগ্ন। অনিবার্যভাবেই নির্যাতিত জনগণ মুক্তিযুদ্ধকে গ্রহণ করেছিল নবমুক্তির উদ্বোধনী শক্তি হিসেবে। একই সঙ্গে এ-নাটক পূর্ববাংলার জনগণের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ ও নিপীড়ন এবং সামগ্রিকভাবে চিরায়ত শোষক-শোষিতের দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্কের মর্মোদঘাটন।

পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় নাটকে সতেরো গ্রামের গ্রামবাসীর সংলাপে, উপমা-চিত্রকল্পের অভিনবত্বে, আবহমান গ্রামজীবনে মুক্তিযুদ্ধের শিল্পিত উপস্থাপনে সৈয়দ হক প্রাতিস্বিকতার পরিচয় দিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধকে প্রান্তজনের চোখে দেখার প্রয়াস তাঁর সচেতন শিল্পনিরীক্ষারই প্রকাশ। এ প্রসঙ্গে তাঁর *কাব্যনাট্য সংগ্রহের* (১৯৯১) ভূমিকায় তিনি উল্লেখ করেন :

> আমাদের মাটির নাট্যবুদ্ধিতে কাব্য এবং সংগীতই হচ্ছে নাটকের স্বাভাবিক আশ্রয়; আরো লক্ষ্য করি, আমাদের শ্রমজীবী মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতাই হচ্ছে এক ধরনের কবিতাশ্রয়ী উপমা, চিত্রকল্প, রূপকল্প উচ্চারণ করা – আমাদের রাজনৈতিক শ্লোগানগুলো তো ছন্দ ও মিল নির্ভর; (শামসুল ১৯৯১ : ভূমিকা)

কাব্যনাট্যের মতো একটি গাম্ভীর্যপূর্ণ শিল্পপ্রকরণে রাজনীতি ও সমকালীন উত্তাল চেতনাস্রোতকে সংযুক্ত করার দুঃসাহসিক অভিযাত্রায় অংশ নিয়েছেন তিনি। এক্ষেত্রে তাঁর সাফল্য ঈর্ষণীয়। কাব্যনাট্যের আঙ্গিকে রচিত এই নাটক আঞ্চলিক শব্দের নিপুণ ব্যবহারে যুদ্ধকালীন উত্তর বাংলার গ্রামীণজীবনকে যেন শব্দবন্দী করে ধরে রেখেছেন। ভাষার গীতময়তা, আঞ্চলিক শব্দের কুশলী প্রয়োগ এবং যুদ্ধকালীন জীবনবাস্তবতার কাব্যিক উচ্চারণে "পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে একটি পালাবদলকারী নাটক বলে বিবেচিত।" (বিশ্বজিৎ ২০০৯ : ১৫১) প্রান্তিক মানুষের মুক্তিযুদ্ধভাবনা এই স্বতন্ত্র উপস্থাপনার ভিত্তিমূলে প্রোথিত।

পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় নাটক রচিত হয় ১৯৭৫ সালের পহেলা মে থেকে ১৩ই জুন কাল পরিসরে। সৈয়দ হক তখন লন্ডনে অবস্থান করছিলেন। (তারিকুল ২০০৮ : ১৬০) ঢাকার 'থিয়েটার' (বেইলি রোড) নাট্যদল নাট্যজন আবদুল্লাহ আল মামুনের (১৯৪২-২০০৮) নির্দেশনায় নাটকটির প্রথম মঞ্চায়ন করেছিল ১৯৭৬ সালে। (সারা ২০১৫ : ৩৪৭) মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সমকালে আরও কিছু নাটক মঞ্চস্থ হলেও *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* ছিল মঞ্চসফল নাটক। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে নাটকের ও

থিয়েটারের উজ্জ্বল সময়পর্বকে উজ্জ্বলতর করেছে এই নাটক। এ-বিষয়ে নাট্যসংশ্লিষ্টদের মন্তব্যে তা আরও স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যায় :

> ১। তাঁর *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। কাব্যনাটক যে এত সাবলীল, স্বচ্ছন্দ হতে পারে তা ভাবিনি কোনোদিন। এবং এর নানা রংয়ের ভাষা-উপভাষার মিশ্রণে অঙ্গাঙ্গিভাবে নাটকের শরীরে জড়িয়ে আছে যেন এমন এক আবেদন যে, তখনকার নাট্যজনেরা চমৎকৃত হয়ে আবিষ্কার করি, আমাদের মঞ্চে এসেছে যেন বাঁধভাঙা এক নতুন জোয়ার। (আলী ২০১৭ : ৭০৪)
>
> ২। *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* আমার বিবেচনায় মুক্তিযুদ্ধের উপর শ্রেষ্ঠ নাটক। এখানে কেবল আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা নয়, ধর্মান্ধতা বা কুসংস্কার থেকে মুক্তির কথা বলা হয়েছে। (রামেন্দু ২০১৫ : ৩৩২)
>
> ৩. নাটকটির পটভূমি আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে আবর্তিত কিন্তু নাটকটির অন্তরে প্রোথিত আছে জীবনের মৌল প্রশ্নমালা যা আমাদের যাপিত জীবনের বোধ ও বিশ্বাসকে নানাভাবে বিদ্ধ করে। (আতাউর ২০১৫ : ৩৩৯)
>
> ৪. 'থিয়েটার' নাট্যদলের প্রযোজনায় আবদুল্লাহ আল-মামুনের সৃজনশীল নির্দেশনায় ফেরদৌসী মজুমদার ও আবদুল্লাহ আল-মামুনসহ অনেক গুণী শিল্পীদের অভিনয়ে যে নাটক চার দশক ধরে দর্শকের তৃষ্ণা মিটিয়েছে, আজও মেটাচ্ছে, মেটাবে আরও শত শতক, যতদিন এই মাটিতে ধর্মের নামে রাজনীতি থাকবে, ধর্মের নামে মানুষেরই হাতে মানবতার দলন থাকবে, ততদিন থাকবে *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* নাটকের আবেদন। (অনন্ত ২০১৫ : ৩৯২)

মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে মঞ্চস্থ এ-নাটক একাত্তর-সমকালীন মানুষের মনে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করেছে এবং একাত্তর-পরবর্তী প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিবাদী চেতনা সঞ্চারিত করেছে।

২.

পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় নাটকের পরিপ্রেক্ষিত ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ, যার স্থানিক পটভূমি সতেরো গ্রাম নামক একটি গ্রাম। চরিত্র হিসেবে পাওয়া যায় গ্রামবাসী, মাতবর, মাতবর-কন্যা, পীরসাহেব, পাইক, তরুণদল ও মুক্তিযোদ্ধাদের। চরিত্র হিসেবে কোনো ব্যক্তিবিশেষের নাম এখানে পাওয়া যায় না। ফলে এই গ্রাম যেমন বিশেষ কোনো গ্রাম নয়, তেমনি গ্রামবাসীরাও এখানে নির্বিশেষ। '*পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* নাটকের উল্লিখিত ঘটনা শুধু সতেরো গ্রামের ঘটনাই নয়, যুদ্ধকালীন বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামেই এরকম ঘটনা ঘটেছে। সকল গ্রামের মাতবরের প্রতিনিধিত্ব করছে সতেরো গ্রামের মাতবর।' (জলী ২০১২ : ১৮১) এ-নাটকের ঘটনাপ্রবাহ সরল ও সামান্য। মুক্তিবাহিনীর দূরাগত পদধ্বনি শ্রবণে গ্রামবাসীর উৎকণ্ঠা, শঙ্কা ও কৌতূহল দিয়ে নাট্যক্রিয়ার উন্মোচন ঘটে। উৎকণ্ঠিত জনতা গ্রামপ্রধান মাতবরের গৃহপ্রাঙ্গণে সমবেত হয় এবং একতাবদ্ধ হয়ে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে

নিজেদের দ্বিধার অবসান চায়। মুক্তিযুদ্ধবিরোধী মাতবর পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার্থে গ্রামবাসীকে প্ররোচিত করে। কিন্তু নাট্যদৃশ্যে মাতবর-কন্যার আগমনে ও তার সত্য উচ্চারণের মধ্য দিয়ে মাতবরের মুখোশ উন্মোচিত হয়। পীর চরিত্র এই নাট্যদ্বন্দ্বে দার্শনিক চরিত্ররূপে অবস্থান করে। মুক্তিযোদ্ধাদের আগমনের মধ্যদিয়ে সমাপ্তি ঘটে নাটকের।

৩.

সতেরো গ্রামের অধিবাসীরা বাংলাদেশের সকল সাধারণ, নিপীড়িত, সাহজিক জীবনে অভ্যস্ত মানুষের প্রতিনিধি। এই নাটকে গ্রামবাসীর কণ্ঠেই উঠে এসেছে প্রান্তজনের জীবনবাস্তবতা ও আর্থসামাজিক বাস্তবতার স্পষ্ট চিত্র।

গ্রামবাসী : খ্যাতে যে কিষাণ হাল দিয়া শস্য করে
– শস্য না দুঃখের দানা ওঠে তার ঘরে।
গহীন গাঙে যে মাঝি জালে মাছ ধরে
– মাছ না নিজের জান বড় জালে পড়ে। (শামসুল ১৯৯১ : ৩১)

গ্রামবাসীরা কৃষিজীবী, শ্রমজীবী, ধর্মভীরু ও বিশ্বাসপ্রবণ। তাদের জীবনভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে আচারে ও ভাষায় :

গ্রামবাসী : সাধারণ লোক আমরা, করি হালচাষ,
ইশারার চেয়ে ভালো বুঝি যা প্রকাশ। (শামসুল ১৯৯১ : ৩৫)

বাংলাদেশের এই সাধারণ, স্বভাবভীরু, দুর্বল ও সহজ-সরল মানুষ যে মুক্তিযুদ্ধকে একান্ত সহজাতভাবে গ্রহণ করতে পেরেছিল তার ধারাবাহিক চিত্র গ্রামবাসীর কর্মোদ্যোগের মধ্যে প্রকাশিত। জীবনযাপনে সাধারণ এবং চিন্তনক্রিয়ায় সরল বলেই রাষ্ট্রীয় জটিল সংকটকে এরা সহজে ধরতে পারে না। তাদের প্রাত্যহিক কর্মপ্রক্রিয়া ও জীবনাচারে জাতীয় রাজনীতি প্রত্যক্ষ ভূমিকাও রাখে না। এতৎসত্ত্বেও জননী-জন্মভূমির অব্যাহত সংকটে তারা শেষাবধি উদাসীরও থাকে না। প্রকৃতিই তাদের সামনে উন্মোচন করে বিপদের কার্যকারণ-উৎস :

গ্রামবাসী : আম গাছে আম নাই শিলে পড়ছে সব
ফুলগাছে ফুল নাই গোটা ঝরছে সব
সেই ফুল সেই ফল মানুষের মেলা
সন্ধ্যার আগেই য্যান ভরা সন্ধ্যাবেলা (শামসুল ১৯৯১ : ১৫)

মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সঠিক ধারণার অভাবে তারা দ্বিধাদীর্ণ। মাতবরের প্ররোচনায় মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি বিরুদ্ধ মন নিয়ে নিশ্চেতন হয়ে পড়েছিল গ্রামবাসী।

অবশেষে যখন তারা জানতে পারে – যমুনা পার হয়ে মুক্তিযোদ্ধারা আসছে, তখন তারা এই সংবাদে হয়ে ওঠে চিন্তিত ও শঙ্কিত :

গ্রামবাসী : আসে ঐ মুক্তিবাহিনী পুব দিক দিয়া
যমুনা সাঁতার দিয়া
আইজ কিংবা কাইল বড়জোর
সক্কলের বুকের ভিতর
কানা এক জন্তুর লাহান খালি কি য্যান লাফায়
আর নাড়ি ছিঁড়া খায় (শামসুল ১৯৯১ : ১৮)

অতঃপর প্রাত্যহিক জীবন-যাপন যখন বিঘ্নসংকুল হয়ে পড়ে তখন সমকালীন সংকট তাদের স্পর্শ করে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের মর্মার্থ সঠিকভাবে অনুধাবন করতে না পেরে তারা ভুগতে থাকে দোলাচলে। তাই মাতবর-কথিত মিথ্যা তথ্যে মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করে তারা :

গ্রামবাসী : মুক্তিবাহিনীর থিকা দূরে থাকা লাগে
তারা নিজেরই ছাওয়াল আর ভাই-বেরাদর
হইলেও কইছেন দুষমনের চর
কইছেন কুটুম্বিতা নাই তার সাথে
আসলে এ দ্যাশ তারা দিতে চায় দুষমনের হাতে। (শামসুল ১৯৯১ : ১৮)

কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই রাষ্ট্রীয় বিপন্নতা স্পর্শ করে এই সাধারণ গ্রামবাসীকেও। তাই তাদের অতিসাধারণ কর্মমুখী জীবনযাপন হয় বাধাগ্রস্ত, তাদের কপালরেখায় ভাঁজ পড়ে। চিরকাল মাতবরকে তারা বিশ্বাস করেছে নিঃসংশয়ে। গ্রামীণ সমাজবিন্যাসে ও সংস্কৃতিতে গ্রামপ্রধানকে বা গ্রামের মাতবরকে মেনে তার পরামর্শ মতো জীবন পরিচালনার যে রীতি লৌকিক জীবনে প্রচলিত, তার রূপ এই গ্রামবাসীদের সঙ্গে মাতবরের সম্পর্কসূত্রের মধ্য দিয়ে অনুভব করা যায়। শঙ্কিত মানুষ দলে দলে উপস্থিত হয় মাতবরের বাড়িতে। উদ্ভূত পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের জন্য মাতবরের শরণাপন্ন হয় সমবেত জনতা :

গ্রামবাসী : তবু কিছু কই নাই আপনের হুকুম
আল্লার রশির গোড়া শক্ত কইরা ধইরা গেছি ঘুম
পইড়া থাকছি মড়ার লাহান
তফাৎ যখন নাই জীয়ন্তেও মড়ার সমান (শামসুল ১৯৯১ : ১৯)

কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা সম্পর্কিত বিচিত্র প্রশ্ন যখন তাদের নানাভাবে আন্দোলিত করতে থাকে, তখন তারা মাতবরের মুখোমুখি হয় এবং তাকে মুক্তিযুদ্ধের প্রাসঙ্গিকতা

নিয়ে প্রশ্নবানে জর্জরিত করতে থাকে। গ্রামীণ সাধারণ মানুষ, যারা চিরকাল শাসন আর শোষণকে নিয়তির অনিবার্য বিধানরূপে মান্য করে এসেছে, তাদের এই আকস্মিক উজ্জীবন নিপীড়িত মানুষের প্রতিবাদী সত্তায় পরিণত হওয়ার অনিবার্যতাকে নির্দেশ করে। সাধারণ মানুষের এই অভাবিত চেতনার উদ্বোধক মহান মুক্তিযুদ্ধ। গ্রামবাসীর সামনে মাতবরের সকল কুকীর্তি স্পষ্ট হয়ে যাবার পর সমবেত কণ্ঠে তারা মাতবরের উপযুক্ত শাস্তি দাবি করে :

গ্রামবাসী : আমাদের সুখ শান্তি আশা
নিজের স্বার্থের লোভে জলে দিছে ভাসা
এই সে লোকটা।
... যতক্ষণ
জীবিত সে আছে, নাই আমাদের নিজের জীবন। (শামসুল ১৯৯১ : ৫৩)

মাতবরের জীবনযাপনের সচ্ছলতা আর নিজেদের দৈনন্দিন দারিদ্র্য ও ক্লিষ্টতার প্রসঙ্গ টেনে তারা জানিয়ে দেয় ঈশ্বরের বণ্টনবঞ্চনায়ও তারা অতৃপ্ত ছিল না কখনোই :

গ্রামবাসী : যাদের জীবন হইল জন্তুর লাহান
তারে কিছু দ্যাও নাই, দিয়াছো ঈমান;
আর যারে সকলি দিয়াছো, অধিকার
তারেই দিয়াছো তুমি দুনিয়ার ঈমান মাপার। (শামসুল ১৯৯১ : ২৬-২৭)

যে ধর্মকে তারা জীবনের নিদান হিসেবে চিরকাল জেনে এসেছিল, সেই ধর্মের প্রচলিত বিধি-বিধানের প্রতিই তারা প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়। তারা বুঝতে পারে, স্বার্থান্ধ মানুষ জীবন-বৈতরণী পার হবার জন্য ধর্মকে অনৈতিক উপায়ে ব্যবহার করে। তাদের এই জাগরণ মূলত ধর্মের ভিত্তিতে গড়ে-ওঠা পাকিস্তান রাষ্ট্রের অনাচার এবং উন্মুল অস্তিত্বকেই যেন প্রতীকায়িত করে।

সাধারণ মানুষের আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে সঙ্ঘশক্তিতে উজ্জীবিত হওয়ার প্রসঙ্গ এই নাটকে উচ্চারিত। নাগরিক বিচ্ছিন্নতার বিপরীতে গ্রামজনতার সঙ্ঘশক্তি বাঙালির আবহমান সমাজকাঠামোর শক্তির স্থানকে পুনর্চিহ্নিত করে। "সৈয়দ শামসুল হক এ কাব্যনাটকে বাংলাদেশের সর্বাধিক গৌরবান্বিত ঐতিহাসিক ঘটনা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এ দেশের সমাজ সংস্কৃতি সর্বোপরি গণমানুষের জীবনবোধ উপস্থাপন করেছেন। 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' কাব্যনাটকের অনুপম কাহিনীর অবিচ্ছেদ্যতার পাশাপাশি

নাট্যকারের অসামান্য কাব্যপ্রতিভার চমৎকার সমন্বয় সাধিত হয়েছে।" (অনুপম ২০১০ : ১৩৯)

বাংলাদেশের গণমানুষ, যারা মূলত গ্রামসমাজের অংশ, তাদেরকে এই নাটকে পাওয়া যায় নতুনরূপে; সঙ্ঘশক্তির সামষ্টিক চেতনায়। 'সতেরো গ্রামের মানুষগুলো প্রকৃত বিবেচনায় নিম্নবর্গের। তবে এই নিরীহ মানুষগুলোর জীবনসংগ্রাম নাট্যঘটনায় মুখ্য নয়, বরং এখানে তাদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে নাট্যকার প্রধান হিসেবে তুলে ধরেছেন।' (বোরহান ২০১৪ : ৪৪) অপরাপর প্রান্তিক মানুষের মতোই নিজেদের অজান্তেই এই নাটকের গ্রামবাসী সংকটের মুখোমুখি হয়। তারা সচেতনভাবে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে অবগত না হয়েও হয়ে যায় মুক্তিযুদ্ধের অংশ। তাদের সমাজবিন্যাস ও মনোবিন্যাসে মুক্তিযুদ্ধ ভিন্নমাত্রিক ব্যঞ্জনায় উপস্থাপিত হয়। মুক্তিযুদ্ধ যে শেষপর্যন্ত একটি জনযুদ্ধ তা-ও এই প্রান্তিক মানুষের জীবনায়ন ও উচ্চারণের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সাধারণ মানুষের যে ব্যাপক জনসমর্থন ও গ্রহণযোগ্যতা ছিল, তা নাট্যিক পটভূমিতে তুলে আনা এ-নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য। ১৯৭১-এর কয়েক বছর পরে লেখা নাটকটি তৎকালীন সময়-পরিবেশে সাধারণ মানুষের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের ইতিবাদী গ্রহণযোগ্যতা ও সমর্থনকে পুনরুজ্জীবিত করে। সমকালে, কিংবা মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তীকালীন সময়পর্বে যারা মুক্তিযুদ্ধের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল, তাদের প্রতি একটি নীরব উত্তর নাটকে নিহিত রয়েছে। উদ্দেশ্যবাদী সাহিত্যিকের মতোই সৈয়দ শামসুল হক স্পষ্ট জানিয়ে দেন বাংলার সাধারণ মানুষ মুক্তিযুদ্ধকে সর্বতোভাবে গ্রহণ করেছিল। কারণ তাদের জীবন, ভূমি আর নারী যখন অন্যের দখলে, সমাজ-সংসার যখন নষ্টের আওতায়, তখন মুক্তিযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী 'উত্তর' হয়ে ওঠে। গ্রামবাসীর কণ্ঠে যে প্রতিবাদী উচ্চারণ শোনা যায় তা সামষ্টিক উচ্চারণ বা যূথস্বর। এই যূথস্বর চিনিয়ে দেয় প্রান্তজনের শক্তির মাত্রাকে। কেন্দ্র বা প্রান্তপ্রধানদের কপটতাকে কখনোই প্রশ্রয় দেয় না প্রান্তিক সাধারণ জনতা। বিলম্বে হলেও তারা অন্যায়কে শনাক্ত করতে পারে, প্রতিবাদ করে ঋজু ভঙ্গিতে, এবং তা ছড়িয়ে দেয় সমাজের সর্বস্তরে। এটি কোনো একক অভিজ্ঞতা নয়, যৌথ অভিজ্ঞতা। যৌথ কণ্ঠস্বরে তাদের প্রতিবাদ উচ্চারিত হবার ফলে প্রান্তজনের আশা আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন, হতাশা, প্রয়োজন, আনন্দ যৌক্তিক ভিত্তি পায় এই নাটকে।

পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় নাটকে মাতবর পাকিস্তানের দোসর রাজাকার চরিত্র। এছাড়াও সে শোষক শ্রেণির প্রতিনিধি। মুক্তিযুদ্ধে তার অবস্থান পাকিস্তানের পক্ষে। নিজ কন্যাকে পাকিস্তানি সেনার হাতে তুলে দিয়ে সে আত্মপ্রতারণার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। সতেরো গ্রামের গ্রামবাসীরা মাতবরকে বহুদিন ধরে গ্রামের প্রধান কর্তাব্যক্তি হিসেবে জেনে এসেছে। তার ব্যক্তিত্ব গ্রামের মানুষের কাছে মহিরুহের মতো, যার

অস্তিত্বের শেকড় গ্রামের গভীরে। 'সতেরো গ্রামের মাতবর তাদের দিকনির্দেশনা দেয়, ধর্মের চর্চা ও নিয়তির বিধান নির্ধারণ করে দেয়। মাতবর এখানে গ্রামপ্রধানই শুধু নয়, সর্বশ্রেণির জনমানুষের নির্দেশদাতা, মানুষের নিয়ন্ত্রণ শক্তির আধার ও উৎস মাতবর।' (শহীদ ২০১৬ : ১২১) কিন্তু গ্রামবাসীর ওপর আধিপত্য থাকায় গ্রামবাসীকে মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে মাতবর। গ্রামের বয়োবৃদ্ধরা মাতবরের আজ্ঞাবহ হলেও যুবকদল মাতবরের কথা বেদবাক্য বলে স্বীকার করে নিতে আগ্রহী নয়। তারা মাতবরের কাছে স্পষ্ট জবাব চায়। তখন মাতবরের প্রভাবশালী কণ্ঠ থেকে প্রতিধ্বনিত হয় :

মাতবর : বেয়াদপ বেশরম, আমারই উঠানে
আমারই মুখের পরে? তরে আর জানে
বাঁচাবো না। দাও দিয়া কোপায়া কাটব।
জিহ্বা ছিঁড়া কুত্তারে খাওয়াবো। (শামসুল ১৯৯১ : ২০)

যুদ্ধকালীন বিপদাপন্ন পরিস্থিতিতে মাতবরের অসহযোগিতায় গ্রামবাসী রুষ্ট। অন্যদিকে মাতবর মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে করেছে বিস্তর মিথ্যাচার। মুক্তিযুদ্ধের গনগনে হাওয়ায়ও গ্রামবাসীকে নিষ্ক্রিয় থাকার পরামর্শ দেয় মাতবর। অল্পবয়স্কদের দেয় ধমক, আর বয়স্কদের দেয় সান্ত্বনা :

মাতবর : দেশ রক্ষা করা হইল পানি না নাড়ায়া
পানির উপরে ঠিক রাখা নিজ ছায়া। (শামসুল ১৯৯১ : ২৪)

তার বর্ণনায় দেশরক্ষা মূলত পাকিস্তানের অখণ্ড সত্তাকে রক্ষা করা। অর্থাৎ গ্রামবাসীকে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে নিষ্ক্রিয় থেকে অখণ্ড পাকিস্তান রক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। মাতবরের মতে, মুক্তিযোদ্ধারা শত্রু; গ্রামবাসীর উচিত উপস্থিত পরিস্থিতিতে ভয় না পেয়ে ঈশ্বরে আস্থা রাখা। আত্মস্বার্থে মাতবর ধর্মকে ব্যবহার বর্মরূপে :

মাতবর : আল্লার তরফ আছি আমরা যখন
ডর নাই, কোনো ডর নাই, দুষমন
নিজেই নিজের থিকা শেষ হয়া যাবে।
আল্লা ছাড়া গতি নাই যে পার করাবে।
ঈমান রাখতে পারো যদি তার পর
আবার সলোক হবে আন্ধার ঘর। (শামসুল ১৯৯১ : ২৫)

মুক্তিযুদ্ধের সংবাদ ও মুক্তিযোদ্ধার দূরাগত পদধ্বনি শুনে গ্রামবাসী কৌতূহলী হয়ে পড়লে মাতবর ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে গ্রামবাসীকে শান্ত করার চেষ্টা করেন। ধর্মীয় অনুষঙ্গ টেনে তিনি গ্রামবাসীকে আপন মতের অধীন করতে চান। কিন্তু গ্রামবাসীরা

পরিস্থিতির উত্তাপ আঁচ করে আল্লাহর ওপর সকল দায়িত্ব সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে চায় না :

গ্রামবাসী : আল্লার উপরে আপনে দিলেন যে ভাবে
সকল দায়িত্ব দিয়া, মনে হয় তাতে
নিজের করার কিছু নাই দুনিয়াতে।
অথচ তিনিই দিয়া দিয়াছেন হাত আর বুদ্ধি বিবেচনা;
কইছেন, তোমার ভাগ্য তোমারই রচনা। (শামসুল ১৯৯১ : ২৫)

মাতবরের চরিত্রে শঠতা ও ক্ষমতার সংমিশ্রণ লক্ষণীয়। পাকিস্তান রক্ষার কাজকে তিনি তাই সংবেদনার সঙ্গে উপস্থাপন করেন, চেষ্টা করেন জনমত আদায়ের। দেশের অখণ্ডতার বিরুদ্ধে গ্রামবাসীর উচ্চারিত বক্তব্যকে তিনি 'হারাম', 'নাফরমানি', 'কুফর' বলে চিহ্নিত করেন। কিন্তু সমাবিষ্ট গ্রামবাসীর কাছে তাঁর তথাকথিত ধর্মীয় যুক্তি টেকে না। বরং গ্রামবাসীর কণ্ঠে শোনা যায় ধর্মের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে স্পষ্ট উচ্চারণ : 'কথায় কথায় খালি আল্লারে টানেন।' (শামসুল ১৯৯১ : ২৫) গ্রামবাসীর স্বচ্ছ প্রশ্নের কাছে বিপন্ন মাতবর প্রসঙ্গান্তরে চলে যান। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের পদধ্বনির পরিবর্তে তিনি শুনতে পান যমুনার ওপার থেকে ভেসে আসা হাট-মাঠের ধ্বনি। মাতবরকন্যা ও গ্রামবাসীর দৃষ্টিতে সেই শব্দ মাতবরের আসন্ন পতনের ইঙ্গিতবাহী। মাতবর তাঁর স্বভাবসুলভ দাপটে বোঝাতে চান যে, মুক্তিবাহিনীর হাতে কোনো ক্ষমতা নেই, পাকিস্তানি সেনারা সবকিছু দখলে রেখেছে।

মাতবর : সাধ্য নাই মুক্তিবাহিনীর
এতটুক কানা ভাঙে রূপার কলসীর। (শামসুল ১৯৯১ : ৩৬)

কিন্তু সাতদিনের মধ্যে যখন কেউ গ্রামে পাক মিলিটারি দেখেনি, তখন তাদের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে প্রশ্ন তোলে গ্রামবাসী। কারণ যুদ্ধের শুরুতে প্রচুর পাকসেনা গ্রামে 'মজুদ' থাকলেও বর্তমানে তাদের অনুপস্থিতিকে মুক্তিবাহিনীর আগমনের ইঙ্গিত মনে করে গ্রামবাসী। হানাদার ক্যাপ্টেন গত রাতেও গ্রামে ঘুরে গেছে – এ তথ্য মাতবর আত্মরক্ষায় গ্রামবাসীর সামনে তুলে ধরলেই এই তথ্য তাঁর জন্য আত্মঘাতী প্রমাণিত হয়। মাতবরের কন্যার জবানিতে জানা যায় – মাতবর ক্যাপ্টেনকে সন্তুষ্ট করতে নিজ কন্যাকেই তুলে দিয়েছে ক্যাপ্টেনের হাতে। এই তথ্য জানিয়ে গ্রামবাসীর সামনে মাতবরকন্যা আত্মহত্যা করলে গ্রামবাসী মাতবরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। গ্রামবাসীর সম্মিলিত প্রচেষ্টার কাছে অসহায় হয়ে পড়েন মাতবর। এবার গ্রামবাসী সরাসরি অভিযুক্ত করে মাতবরকে। মাতবরের জীবননাশকে নিজেদের উদ্ধারের প্রধান কর্তব্য জ্ঞান করে গ্রামবাসী। মৃত্যু আসন্ন জেনে মাতবর সতেরো গ্রামে নিজের কবর দাবি করেন। রুষ্ট জনতা তাতে অস্বীকৃতি জানায়। অবশেষে মুক্তিযোদ্ধাদের আগমন

ঘটে প্রচণ্ড পদধ্বনিতে। নাটকের শেষে মাতবরের মৃত্যু হলেও এই মৃত্যুর দায় নাট্যকার গ্রামবাসীকে দেননি। মাতবরের মৃত্যু হয় পাইকের হাতে।

মাতবর মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তি। পাকিস্তান রক্ষায় তাঁর কোনো নৈতিক অবস্থান চোখে পড়ে না। আত্মস্বার্থ রক্ষাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য বলে মনে হয়। তারপরও এ-কথা বলা যায়, মাতবর টাইপ শ্রেণির রাজাকার চরিত্র নয়। শোষকশ্রেণির প্রতিনিধি হিসেবেই বরং তাকে চিহ্নিত করা যায়। গ্রামের মানুষের ওপর তাঁর আধিপত্য বিস্তারের কামনা প্রবল। ক্ষমতাচর্চার অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয় সশস্ত্র পাইক। গ্রামবাসীর মধ্যে ভ্রান্তি সৃষ্টি করে মুক্তিযুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিপরীত ধারণা জন্ম দেওয়ায় মাতবর চরিত্রে কুটিলতা ও কপটতার বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট। পাকবাহিনীকে সহযোগিতা করে আত্মস্বার্থোদ্ধারে মাতবর অন্ধ। কিন্তু বিষাক্ত সর্পসঙ্গের মতোই পাকসেনা মাতবরের কন্যাকে ভোগ করতে চাইলে নিরুপায় ও বাধ্য হয়ে তাকে ক্যাপ্টেনের হাতে তুলে দিতে হয়। এ-থেকে মাতবরের ক্ষমতা ও দাপটের সঙ্গে যুক্ত হয় তার ভীরুতা ও নীচতা। গ্রামবাসীকে পীড়নকারী মাতবর অবশেষে গ্রামবাসীর করুণার পাত্রে পরিণত হন। গ্রামবাসীর সামনে পাকবাহিনীর প্রতি তাঁর সহযোগিতার কথা স্বীকার করতে বাধ্য হন মাতবর।

পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় নাটকে এই ঘৃণিত চরিত্রকেও নাট্যকার মানবিকভাবে উপস্থাপন করেছেন। রাজাকার চরিত্রকে প্রথাগত পরিবেশনার বাইরে গিয়ে মানবিক করে তোলার মধ্যে বৃহত্তর ইতিবাচকতার প্রতি সৈয়দ হকের পক্ষপাত স্পষ্ট। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য :

> চোখের সামনে কন্যা ধর্ষিত হওয়ার সেই করুণ বাস্তবতার মুখোমুখি অসহায় পিতা, তখন তিনি একান্তভাবেই পিতা, কলেমা পড়ে কন্যাকে সমর্পণ করতে চান ক্যাপ্টেনের হাতে, এ ভাবে নিষ্ঠুর পীড়নের বাস্তবতা ঢেকে দিতে চান ধর্মাচারের দোহাই টেনে, কিন্তু তাতে তো ভয়ংকরতার কোনো কমতি ঘটে না, বরং রূঢ় বাস্তবের সামনে মানুষের অসহায়ত্ব পায় আরেক ব্যঞ্জনা। (মফিদুল ২০১৫ : ৩৫৩)

মাতবর চরিত্রের অপরাধী-মনস্তত্ত্ব উন্মোচনে আধুনিক সাহিত্যবৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন লক্ষণীয়। মাতবর রূপান্তরশীল চরিত্র। ক্ষমতার মহিরুহসম মাতবর সকলের দৃষ্টিতে পতিত হবার পর তার স্বীকারোক্তি সাধারণ মানুষের মতোই শোনায়। মাতবর চরিত্র নির্মাণে সৈয়দ হকের সচেতনতা সম্পর্কে গবেষকের বক্তব্য :

> তিনি বাংলাদেশের সমাজ, সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং সর্বোপরি গণমানুষের মুখের ভাষা সম্পর্কে তাঁর দায় (Responsibility) পরিশোধ করেছেন। সমকালীন জীবনকে এঁকেছেন। মুক্তিযুদ্ধকে দেখেছেন নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে। সে কারণে রাজাকার মাতবর নায়ক চরিত্রের মর্যাদা পেয়েছে। সবাই তারা এদেশের সন্তান – এ সার্বজনীন বোধ নাটকের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। (তারিকুল ২০০৮ : ১৭৭)

কন্যার মৃত্যুর সময়ে মাতবরের সংলাপ তার ক্ষতাক্ত হৃদয়েরই অভিব্যক্তি। কন্যার মৃত্যু আর ক্ষমতার পতন মাতবর চরিত্রের ট্র্যাজেডির মূল। উচ্চকণ্ঠ নেতা থেকে পতিত মানবাত্মায় তার রূপান্তর। উপমাত্মক ভাষায় সজ্জিত তার কথামালা রাজনীতি ও জীবননীতি সম্পর্কে তার জ্ঞানহীনতার সত্যকে উন্মেচিত করে।

পিতার নিষ্ঠুরতার শিকার মাতবর-কন্যা গ্রামবাসীর কাছে মাতবরের প্রকৃত রূপ উন্মোচন করে। রাত্রি দ্বিপ্রহরে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কপট-বিয়ের পর নিগৃহীত হয়ে প্রাণবন্ত মেয়েটি হারায় তার সর্বস্ব। পাকিস্তানপন্থী পিতার কন্যা হয়েও সে সেনা কর্তৃক নিগ্রহ থেকে রক্ষা পায়নি। তার আর্তহাহাকার নাট্যকারের শক্তিশালী শিল্পপরিচর্যায় মর্মস্পর্শী হয়ে দেখা দেয় :

মেয়ে : ... গ্যাছে সুখ
য্যান কেউ নিয়া গ্যাছে গাভীনের বাঁটে যতটুকু
দুধ আছে নিষ্ঠুর দোহন দিয়া। সুখ নাই এখন সংসারে
দুঃখেরও শক্তি নাই দুঃখ দেয় আবার আমারে – (শামসুল ১৯৯১ : ৫১)

মাতবর-কন্যার এই পরিণতি শওকত ওসমানের (১৯১৭-১৯৯৮) *দুই সৈনিক* (১৯৭৩) উপন্যাসের ঘটনাক্রমের সঙ্গেও সাদৃশ্যপূর্ণ। মাতবর-কন্যা চরিত্রটি জীবনবাদী। হৃতসর্বস্ব হয়ে এই তরুণীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয় জীবনবিতৃষ্ণা আর অবিশ্বাসের নিনাদ :

মেয়ে : যখন আমার বুকে কালসাপ দংশাইয়াছিল
বলেন, জবাব দেন, কোথায়, কোথায়?
বেহেস্তের কোন্ বাগিচায়
বলেন থাকলে পর বান্দার কান্দন তার কানে না পশায়? (শামসুল ১৯৯১ : ৪৯)

সাধারণ গ্রামীণ নারী হিসেবে ধর্মের প্রতি তার অনাস্থা কেবল বেদনাজাত বলে মনে হয় না। এই অনাস্থা সর্বস্বহারানোর বেদনায় তাড়িত এক নারীর হৃদয়মথিত উচ্চারণ। মাতবরের উচ্চারণে যেখানে সবসময় নিয়তি ও আল্লাহর প্রতি অচল আস্থার কথা থাকে, বিপরীতে মাতবর-কন্যার বাক্যে ধ্বনিত হয় জীবনসংলগ্নতার কথা। আশৈশব যে আল্লাহকে সে তার অস্তিত্বের রক্ষক বলে অকপটে বিশ্বাস করেছে সেই তিনিই তাকে পাক হানাদারদের লোলুপতা থেকে রক্ষা করতে পারেনি। তাই মাতবর-কন্যার দৃঢ় বিশ্বাস 'নিরঞ্জন আল্লা নিরাকার – / আরো সত্য, তাঁর ভাষা বহূ দূরে আমার ভাষার।' (শামসুল ১৯৯১ : ৪৮) নাট্যক্রিয়ার শুরু থেকে মাতবর ও পীর সাহেব মুক্তিযুদ্ধের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে যেখানে গ্রামবাসীকে নিষ্ক্রিয় থাকবার পরামর্শ দেয়, সেখানে তার বিপরীতে মাতবর-কন্যার জীবনতৃষ্ণা ও নিয়তিবিমুখতা গ্রামবাসীকে বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। মুক্তিযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে শারীরিক নিগ্রহের শিকার মাতবর-কন্যার আত্মহনন নাটকে মাতবর চরিত্রের ট্র্যাজেডিকে প্রকটিত করে।

পীরমাত্রই স্রষ্টার প্রতি নিবেদিত চরিত্র। গ্রামবাসী সকল বিপদে-আপদে, অসুখে-বিসুখে পীরের শরণাপন্ন হয়। পীর চরিত্রকে একটি দূরদর্শী চরিত্র হিসেবে সৃষ্টি করেছেন সৈয়দ শামসুল হক। প্রাথমিকভাবে পীর মাতবরের সব কাজের সহযোগী। প্রশ্নোন্মুখ তরুণ যুবকদলকে নিষ্ক্রান্ত করতে পীর বলেন : 'মানী মানুষের ইজ্জত করা চাই।/ বটগাছে যদি কুড়াল মারস, চৈতমাসে তার ছায়া নাই।' (শামসুল ১৯৯১ : ১৭) কিন্তু মাতবরের স্বরূপ জানতে পেরে তিনি অবশেষে মুখ ফিরিয়ে নেন। পীর চরিত্রে দেখা মেলে ধর্মীয় দার্শনিকতার। কখনো কখনো পীর চরিত্রকে গ্রিক নাটকের কোরাসের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা যায়। মাতবরের আসন্ন পতনের সূত্রকে পীর অনেক আগেই জানিয়ে দেন দার্শনিক বাক্যবন্ধে :

পীর : সময়ে ফলের গাছে অতি মিষ্ট ফল
না ধইরা ধরে কর্মফল। (শামসুল ১৯৯১ : ২১)

ধর্মের প্রতি আস্থাশীল থেকেও পীর শেষাবধি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষশক্তি। ধর্মীয় ঐতিহ্যের নানা সূত্র ধরে গ্রামবাসীকে শান্ত করার চেষ্টা করেন পীর। কারবালার প্রসঙ্গ-উল্লেখের মধ্য দিয়ে তিনি মুক্তিযুদ্ধের প্রয়োজনীয়তার সপক্ষে তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করেন :

পীর : দুনিয়ায় জালেমের এখনো অভাব
নাই, মাতবর সাব।
আর, নবীর দুলাল আর আমার দুলালে
আল্লার তরফে নাই তফাৎ আসলে। (শামসুল ১৯৯১ : ৩১)

পাপের কর্মফল হিসেবে ক্ষমতার পতন ও কন্যাবিয়োগ মাতবরের জীবনে উপস্থিত বলে মনে করেন পীর। হাবিল-কাবিলের উপকথার মধ্যদিয়ে আদিম পাপের গল্প শুনিয়ে কর্মফলের অমোঘতার ইঙ্গিত দেন পীর। মাতবর সম্পর্কে তিনি জানান – 'আপনের ঈমান ছিল না।' (শামসুল ১৯১১ : ৫২) পীর চরিত্র প্রবীণ ও প্রাজ্ঞ; তিনি মূলত প্রাচীনপন্থী, ধর্মীয় যুক্তি দিয়ে সকল বিষয়কে বিবেচনা করেন। এ চরিত্রের মাধ্যমে নাট্যকার মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ও সাধারণের পক্ষে ধর্মানুশীলনকারীদের অবস্থান নিশ্চিত করেছেন। পীরের দৃষ্টিতে শাশ্বত অন্যায় ও প্রতিবাদ মুক্তিযুদ্ধের সমান্তরাল হয়ে ধরা দেয়।

পীর চরিত্রের একটি দার্শনিক বৈশিষ্ট্য নাট্যক্রিয়ার সর্বশেষে উপস্থাপিত : 'দাগ, একটা দাগ রাইখা যায়।' (শামসুল ১৯৯১ : ৫৬) মাতবরের পতনের মধ্য দিয়ে পাপ নিশ্চিহ্ন হয়েছে বলে মনে করেন না পীর। মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে এক রাজাকার মাতবরের মৃত্যুই যথেষ্ট ছিল না। ১৯৭৫ সালে লেখা এই নাটকে স্বাধীন বাংলাদেশে রাজাকার ও মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধীদের তাণ্ডবের ইঙ্গিত পাওয়া যায় পীরের কথনসূত্রে। ১৯৭১ সাল বাঙালির জাতিসত্তা বিকাশের মহত্তম পর্যায়। মুক্তিযুদ্ধের পরেও মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীরা

এদেশে নানা অপতৎপরতায় লিপ্ত। পীরের মন্তব্যের মধ্য দিয়ে সে-সত্যই উন্মোচিত করেছেন সৈয়দ হক।

৪.

মঞ্চসজ্জার নির্দেশনায় নাট্যকার উল্লেখ করেছেন – নাটকের পরিসমাপ্তিতে থাকবে জাতীয় পতাকার উন্মোচন, যা মঞ্চ-ক্ষেত্রের প্রায় এক-চতুর্থাংশ জুড়ে থাকবে। 'পতাকার প্রতিচ্ছবি নিয়ে দর্শক মিলনায়তন থেকে বেরোয়। যদিও নাটকের গল্প মাতবরের মেয়ের এবং মাতবরের বিয়োগান্তক কাহিনিতে নিহিত। তবুও সব শেষে যুদ্ধে বিজয়ী এক দেশ – সেটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে দর্শকের কাছে।' (সারা ২০১৫ : ৩৪৯) তাই নাটকের সমাপ্তিতে মাতবর-কন্যার আত্মহননের যন্ত্রণা বা মাতবরের ট্র্যাজেডিকে উচ্চমূল্য না দিয়ে বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও স্মরণীয় বিজয়কে উচ্চকিত করেন নাট্যকার।

মুক্তিযুদ্ধ এই নাটকের পটভূমি। গ্রামবাসী, মাতবর, পীর প্রমুখ চরিত্রের মনে মুক্তিযোদ্ধার পায়ের আওয়াজ বিচিত্র প্রভাব ফেলে এই নাটককে স্বাধীনতা ও মুক্তিচেতনার প্রতীকে পরিণত করেছে। পর্দার ওপারে থেকেও এই আওয়াজ নাটকের অন্যতম চরিত্রে পরিণত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া নিয়েই যে এ নাটক, তা আমরা সর্বাংশে উপলব্ধি করি। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের প্রত্যাশা ছিল শোষণমুক্তি। *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* নাটকে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে সতেরো গ্রামের অধিবাসী তথা বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনতার মুক্তি-আকাঙ্ক্ষা বিশ্বের শোষিত মানুষের চিরন্তন শোষণমুক্তির সঙ্গে সমান্তরাল সম্পর্কে যুক্ত হয়।

কাব্যনাটকের কলেবর ভাবনির্ভর। কাব্যনাটকের ভাববাদী পটভূমিতে রাজনীতি ও সামাজিক সংকটকে নাট্যবিষয় হিসেবে সৃজন করা সৈয়দ শামসুল হকের বিশেষ কৃতিত্ব। গ্রামসমাজকে ধারণ করবার যথোপযুক্ত প্রতিবেশ সৃজনেও সৈয়দ হক সিদ্ধহস্ত। এর আরও প্রমাণ মিলবে তাঁর দ্বিতীয় কাব্যনাট্য *নূরলদীনের সারাজীবনে* (১৯৮২) আরও প্রবলভাবে। কাব্যনাটকে শিল্পের বহুগুণের সমষ্টি লক্ষ করা যায়। কবিতায় ভাবের যে বহুমাত্রিক প্রতিসরণ ঘটে তা কাব্যনাট্যেও প্রযোজ্য। মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে চিরন্তন অন্যায় ও শোষণমুক্তির প্রচেষ্টা কাব্যিক অনুষঙ্গে বহুকৌণিক বৈশিষ্ট্যে নির্মিত হয়েছে *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* নাটকে।

পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় কাব্যনাটকে সরাসরি যুদ্ধ নেই, মুক্তিযোদ্ধা বা পাকবাহিনীর শরীরী উপস্থিতি বা সংলাপ নেই, নেই মুক্তিযুদ্ধের প্রচলিত জাতীয়তাবাদী বয়ানের প্রধান দৃশ্যগুলোও। কিন্তু এই নাটক শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রধানত মুক্তিযুদ্ধেরই নাটক। কারণ পুরো নাটকজুড়ে যে পায়ের আওয়াজের কথা শোনা যায় নানাজনের প্রেক্ষণবিন্দু থেকে, তা মুক্তিযোদ্ধাদেরই পায়ের আওয়াজ। গ্রামবাসীর

যূথবদ্ধ উচ্চারণে, তরুণদের কৌতূহলী উচ্চারণে, মাতবরের পাপ ও পতনে এবং বাংলাদেশের প্রতীকরূপী মাতবরকন্যা পরীর আর্তনাদে এই নাটক তার নাট্যশরীরে পূর্বাপর ধারণ করেছে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনারূপ। এখানে মুক্তিযুদ্ধ এসেছে এক নিভৃত গ্রাম সতেরো গ্রামের তথা প্রান্তবর্তী মানুষের চিন্তন ও দর্শনপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে, যা মূলধারার মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় যুক্ত করেছে নতুনতর মাত্রা। ফলে মুক্তিযুদ্ধকে দেখার নতুন ভাষা হিসেবে *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* নাটকটি বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে বিবেচ্য এবং প্রান্তজনের মুক্তিযুদ্ধ-ভাবনার সফল শিল্পসৃষ্টি।

গ্রন্থ ও প্রবন্ধপঞ্জি

অনন্ত হীরা (২০১৫)। 'মোহর ঝরা, সোনার কলমওয়ালা একজন', *জলেশ্বরীর জাদুকর* (শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত), কথাপ্রকাশ, ঢাকা

অনুপম হাসান (২০১০)। *বাংলাদেশের কাব্যনাটক : বিষয় ও প্রকরণ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

আতাউর রহমান (২০১৫)। 'ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়', *জলেশ্বরীর জাদুকর* (শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত), কথাপ্রকাশ, ঢাকা

আলী যাকের (২০১৭)। 'সৈয়দ হক : বাংলার সৃজনশীল সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূলে', *সৈয়দ শামসুল হক স্মরণগ্রন্থ* (হায়াৎ মামুদ ও পিয়াস মজিদ সম্পাদিত), চারুলিপি, ঢাকা

জলী, হোসনে আরা (২০১২)। *বাংলাদেশের নাটক : বিষয়-চেতনা*, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা

তারিকুল আহসান, মোস্তফা (২০০৮)। *সৈয়দ শামসুল হকের সাহিত্যকর্ম*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০০৯)। *বাংলাদেশের সাহিত্য*, আজকাল, ঢাকা

বোরহান বুলবুল (২০১৪)। *বাংলাদেশের নাটকে নিম্নবর্গ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

মফিদুল হক (২০১৫)। 'সৈয়দ শামসুল হকের নাট্যত্রয়ী : তৃতীয় মাত্রার সন্ধানে', *জলেশ্বরীর জাদুকর* (শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত), কথাপ্রকাশ, ঢাকা

রামেন্দু মজুমদার (২০১৫)। 'তাঁর সঙ্গ', *জলেশ্বরীর জাদুকর* (শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত), কথাপ্রকাশ, ঢাকা

শহীদ ইকবাল (২০১৬)। '*পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* : অব্যর্থ বীজভূমির সংজ্ঞা ও নির্মিতি', *কালি ও কলম* (আবুল হাসনাত সম্পাদিত), ত্রয়োদশ বর্ষ, দশম সংখ্যা, ঢাকা

শামসুল হক, সৈয়দ (১৯৯১)। *কাব্যনাট্য সংগ্রহ*, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা

সারা যাকের (২০১৫)। 'নাট্যকারের নির্দেশনায়', *জলেশ্বরীর জাদুকর* (শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত), কথাপ্রকাশ, ঢাকা